ঢাকা শুক্রবার ৫ জুলাই ২০০২

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও শিক্ষক রাজনীতি

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে গত ২৯ জুন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি প্রসঙ্গে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দলীয় রাজনীতি শুধু দেশের ক্ষতি করছে না, রাজনৈতিক দলগুলোরও ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।' সে কারণে তিনি তার বক্তৃতায়, 'সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক কেউ যাতে রাজনীতি করতে না পারেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি কিনা' এমন আহ্বান সকলের প্রতি রেখেছেন। জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন দেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করেন তখন তার গুরুত্বই আলাদা বলে ধরে নিতে হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির কারণে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন; এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোরও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন। সে কারণেই তিনি শিক্ষাঙ্গনে কেউ যাতে রাজনীতি না করতে পারে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস এবং শিক্ষকদের রাজনীতি করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত অভিযোগ ও আহ্বানের আলোকে বিষয়টিকে বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে 'শিক্ষক রাজনীতি'র একটি ধারণা প্রচলিত আছে। এ ধারণার ফলে নাগরিক সমাজে মনে করা হয়ে থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকগণ অবাধে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন, লেখাপড়ায় তেমন সময় দিচ্ছেন না, ইত্যাদি। ধারণাটিতে কিছুটা সত্যতা থাকলেও এর স্বরূপটি অনেকটাই ভিন্ন, এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সে কারণেই এই ধরনের ধারণা ও বাস্তবতার মূলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করছি। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয়। 'রাজনীতি', 'শিক্ষক রাজনীতি', 'দলীয় রাজনীতি' এ ধরনের তিনটি ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে তিনটি ধারণা কোনোমতেই সমার্থক নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহারে আমরা খুব একটা সতর্কতার পরিচয় দিই না, গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ব্যাপক ভুল ধারণাও আমাদের মধ্যে বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতো না; কিংবা জনমনে শিক্ষক, রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, দলীয় রাজনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে এতো ভুল ধারণাও জন্ম নিতো না। সচেতন মহলও বিভিন্ন সময় বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখিতে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনতা ও সতর্কতার পরিচয় দেন না। ফলে সাধারণ মানুষ, এমনকি নাগরিক ও পাঠক সমাজও যথেষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়েন। এসব নিয়ে সমাজে প্রতিনিয়ত যে ধারণা তৈরি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাতে সব কিছুকে একত্রে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা রয়েছে, অস্পষ্টতার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করছি। আসলে এর ফলে বাস্তবতা ও ধারণাগত স্পষ্টতার মধ্যে ব্যাপক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। আমাদের সমাজে যেসব বিষয় নিয়ে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন চিন্তা ও চেতনা গড়ে উঠছে তাতে প্রতিটিতে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার গভীরতার ছাপ খুব একটা পড়ে না, থাকে না; বরং ভাসা ভাসা কিছু বোধ, অনুমান, বিশ্বাস ও ধারণা নিয়েই আমরা মন্তব্য ছুড়ে দিই। আসলে কোনো ক্ষেত্রেই আমরা দেখি না যেখানে কোনো সত্তা, বাস্তবতা ও ধারণার গভীরতাকে স্পর্শ করা হচ্ছে, উন্মোচিত করা হচ্ছে এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা হচ্ছে। ফলে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠছে না কোনো গভীর জ্ঞানগত ধারণা।

নির্ধারিত প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'রাজনীতি' এখন আমাদের সমাজে একটি অবাধ অধিকারের বিষয় বলে স্বীকৃত। রাজনৈতিক দল গঠন ও মতপ্রকাশে সাংবিধানিক কোনো বাধা নেই। প্রতিটি নাগরিকই এ দেশে পছন্দের যেকোনো দলের সমর্থক বা সদস্য হতে পারেন। সেটি পারেন বলেই ভোটাধিকারের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কারো রাজনীতি করা বা না করার অধিকার নেই এমন কথা বলে কোনো দল বা নেতা কারো কাছে ভোট চাইতে পারেন না। আমাদের দেশে ১৮ বছর পূর্ণ হলে যেকোনো নাগরিকই এখন যেহেতু ভোট দিতে পারেন, তাই সেই নাগরিকের রাজনীতি করারও অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়ে থাকে। সুতরাং কারো রাজনীতি করা তথা কোনো রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের সমর্থক হওয়ার অধিকার হরণ করা, কিংবা আইন করে নিষিদ্ধ করার কোনো উদ্যোগ নিতে গেলে দেশের সংবিধান এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠতে পারে। সে কারণে একটি গণতান্ত্রিক দেশে কারো রাজনীতি করার অধিকার নিষিদ্ধ করার বিষয়টি শুধু স্পর্শকাতরই নয়, বেশ জটিল এবং দুরূহ কাজ।

হ্যাঁ, কথা উঠতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা অবস্থায় রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির রাজনৈতিক চর্চার স্বরূপটি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক বিশ্বাস, আচরণ যদি প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ বিঘ্নিত না করে তা হলে সে ব্যক্তির বিশ্বাসের ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা চলে না। শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। দেশের মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন, বুদ্ধিবৃত্তিতে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষকগণ বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাজনীতিও মানুষের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়। শিক্ষকগণ দেশের মানুষকে শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমেই রাজনীতি সচেতন করবেন এটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু বাংলাদেশে বাস্তবে তেমন অবস্থা আদৌ বিরাজ করছে কি?

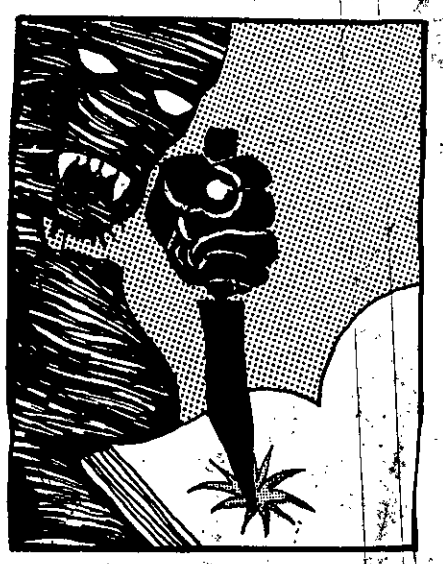

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা, দক্ষতা, ভূমিকা কোনোটিই এমন পর্যায়ে নেই যে দেশে ব্যাপক নিরক্ষরসহ সব স্তরের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের অবদান রাখতে পারে। সামগ্রিক অর্থে রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন, পড়াশোনা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিতে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকই খুব একটা মানসম্মত অবস্থানে নেই। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, বোধ, অন্ধত্ব, ধ্যান-ধারণার বাইরে ব্যাপক লেখাপড়া, গবেষণা, মুক্ত আলোচনা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, দেশ, সমাজ ও বিশ্ববাস্তবতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয়

জ্ঞানলাভের সুযোগ এ সমাজের শিক্ষকদের এমনিতেই খুব একটা নেই, শিক্ষকদের মধ্যে সেই তাগিদও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। রুটি-রুজির সংগ্রামে সব স্তরের শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের 'রাজনীতি' বিষয়ক এক ধরনের সরকারি নিষেধাজ্ঞার ধারণা চাকরিজীবী যেকোনো মহলের মতো শিক্ষকদের মধ্যেও এখনো বহাল আছে। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ ১৯৭৩-এর স্বায়ত্তশাসন বিধান বলে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার ভোগ করে থাকেন। এ ধরনের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দেওয়ার পিছনে মূলত কাজ করেছিল দেশ ও জাতিকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কিছু অতিরিক্ত ভূমিকা পালনের তাগিদ থেকে। আমার ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অধিকার স্বীকার করার পিছনে রাষ্ট্রের মহৎ উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল, শিক্ষকগণ মুক্তবুদ্ধি চর্চার মানুষ হিসেবে দেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ, সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের দোষত্রুটি ধরিয়ে দেবেন, জাতির উন্নতি অগ্রগতির পথ নির্দেশনা দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববর্তী শিক্ষাস্তরে এ ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার শিক্ষকদের জন্য স্বীকৃত হয়নি। ফলে ওইসব স্তরে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজেদের চাকরিজীবীদের মতোই রাজনৈতিকভাবে মুক্ত থাকা মানুষ হিসেবে ভাবেন এবং রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবে সে ধরনের রাজনীতিমুক্ত শিক্ষক খুব বেশি আছেন কি? বরং রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ধারণার বিশ্বাস ও অবস্থান নিয়ে খুব কম শিক্ষকই আছেন। বিভিন্ন দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার নজির মোটেও বিরল ঘটনা নয়, বরং সেটা স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের সামগ্রিক রাজনীতির প্রভাব সমাজের ওপর যেমনভাবে পড়েছে তা থেকে সাধারণ শিক্ষক সমাজও খুব একটা মুক্ত নন। সুবিধাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদসহ বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাস দ্বারা জাতীয় রাজনীতির পশ্চাৎপদ বিষয়গুলো থেকে শিক্ষকগণও খুব একটা মুক্ত থাকতে পারছেন না। সত্যিকার অর্থে রাজনীতিকে বিচার-বিশ্লেষণের চর্চায় আনার সংস্কৃতিতে যুক্ত করার কোনো উদ্যোগ শিক্ষক সমাজ এ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। অধিকন্তু রাজনীতির আপাত সাধারণ তৎপরতা-প্রবণতায় অনেকেই গা ভাসিয়ে চলছেন। এটি কোনোমতেই কাম্য বা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দেশের শিক্ষক সমাজ এখন দেশে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চায় তেমন কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারছেন না বা করছেন না। অধিকন্তু রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। দলের কোনো অপকর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ বা প্রতিবাদ করার নজির খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। দলকে সব ক্ষেত্রে সমর্থনদানের মাধ্যমে দলের আস্থাভাজন হওয়ার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে কারণে এ কথা এখন বলা যাচ্ছে না যে, শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের

> **শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের জন্য শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করা, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা ইত্যাদির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রবণতা, খেয়াল ও উদ্দেশ্য বন্ধ করা। সন্ত্রাসের উৎসে হাত না দিয়ে কারো রাজনীতি করার অধিকার নিষিদ্ধ করলে খুব একটা কাজের কাজ হবে বলে মনে করি না।**

শিক্ষকগণই রাজনীতি করার অধিকার ভোগ করছেন; স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা শিক্ষকগণ তা করছেন না। মাদ্রাসা, বেসরকারি স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের অনেক শিক্ষকই প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, রাজনৈতিক দলের উপজেলা, জেলা বা কেন্দ্রীয় কোনো কোনো দপ্তরও অনেক শিক্ষক বহন করছেন। সরকারি স্কুল ও কলেজের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত না হলেও অনেকেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন উদাহরণ মোটেও বিরল নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শিক্ষক রাজনীতি'র একটা ারণা বেশ প্রচারিত। এক সময় শিক্ষকগণ, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, সরাসরি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না। জাতির বিবেক হিসেবে শিক্ষকগণ বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও ফেডারেশন প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। তবে আশির দশক থেকেই শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নিজেদের মধ্যে কিন্ পর্ষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দলীয় অবস্থানের নেয়। জাতীয় রাজনীতির প্রভাব এর ওপর তে থাকে। শিক্ষকদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ের বাইরে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বিদ্যালয়ের ভিতরেও 'নেতৃত্ব' পাওয়ার াগ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে পিছনে পড়ে সত্যিকার অর্থেই যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্ষকদের এতোদিন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন ই সব প্রতিভাধর, দেশবরেণ্য মেধাবী শিক্ষক; তাদের স্থলাভিষিক্ত যারা হলেন তারা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে অধিকতর যুক্ত; লেখাপড়া, গবেষণাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাগত অবস্থানে তাদের স্থান তেমন উর্ধ্বে নয়। এভাবে নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকগণ জাতীয় রাজনীতির আদলে বড়ো ধরনের দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক দল ও সরকার শিক্ষকদের এ ধরনের দলীয় বিভক্তিতে উল্লসিত হয়েছেন, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির কথা বিবেচনা করেছেন, করছেন। দলের সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনয়নদানের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতির নামে এখন শিক্ষকদের মধ্যে 'দলীয় রাজনীতি' চর্চার একটি প্রবণতা প্রবণভাবে শুরু হয়েছে। এ ধরনের 'দলীয় রাজনীতি'র সঙ্গে যুক্ত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় বা বাইরে অতিরিক্ত কিছু একটা হওয়া যায়, পাওয়া যায়। এটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক ধরনের শিক্ষকদের হিসাব-নিকাশকে নতুনভাবে কষতে সুযোগ করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলের পরিচয় ছাড়া এখন কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে পারছেন না, এটি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। সে কারণেই জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'শিক্ষক রাজনীতি' শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আছেন তারাই যারা দলের নেতা-নেত্রীর অধিক আস্থা অর্জন করতে পারেন। এ ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রখর মেধাবী শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে যাদের ব্যাপক সুখ্যাতি আছে, যারা অধিকতর বিবেক এবং যুক্তি দ্বারা তাড়িত বা পরিচালিত হন তারা এগিয়ে আসছেন না, আসাটি সম্ভবও নয়। দলীয় শিক্ষক রাজনীতিতে এখন এমন অনেককেই দেখা যায় যাদের শিক্ষাগত কৃতিত্ব খুব একটা দেখা যায় না, গবেষণা, লেখালেখি, মুক্তচিন্তা ও পাণ্ডিত্যে স্বাক্ষর রাখার মতো কোনো কাজেও তাদের লক্ষ্য করা যায় না। এরা সরকার এবং রাজনৈতিক দলের ফরমায়েশ পূরণে যতো বেশি ব্যস্ত থাকেন, লেখাপড়া, পাঠদান এবং গবেষণায় ততোটা নন। এছাড়া এরা রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দলের ছাত্র সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। এসব কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় নর্মসের সঙ্গে কতোখানি সঙ্গতিপূর্ণ তা সহজেই বোধগম্য।

এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সেই বিচ্যুতিতে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের ক্যাডার শিক্ষকদের ভূমিকা কতোখানি তা পাঠক এতোক্ষণে বুঝতে পারছেন। তবে এ ধরনের দলীয় রাজনীতির নেতৃত্বের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশির ভাগ শিক্ষকই অবস্থান করছেন। হ্যাঁ, তারা কোনো বিশেষ দল বা রাজনীতির সমর্থক হতেও পারেন, নাও হতে পারেন, কিন্তু সক্রিয় দলীয় রাজনীতির চর্চা অনেকেই করেন না। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক রাজনীতি, দলীয় রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের জাতীয় রাজনীতিবিদগণ কতোখানি পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে আছেন তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসের নামে যেসব ঘটনা ঘটে থাকে সেগুলোর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতার কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া এখন দলীয় শিক্ষক রাজনীতিতেও জাতীয়ভাবে যুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব এবং কর্তৃত্ব এতো বেশি যে, কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষে ওই সব শর্ত পূরণ করে কাজ করা খুব সহজ কাজ নয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন যেসব দলীয় শিক্ষক রাজনীতির প্রভাব জেঁকে বসেছে তা মূলত জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোরই খেয়াল ও 'কৃতিত্ব'। সুতরাং শিক্ষাঙ্গনে সংঘটিত সন্ত্রাসের সঙ্গে যদি কোনো দলীয় শিক্ষক সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা থেকে থাকে তার জন্য দায়ী নিশ্চয়ই সেই রাজনৈতিক দলই। রাজনৈতিক দলগুলোই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে কখনো ছাত্র সংগঠন, কখনো দলীয় শিক্ষক গ্রুপসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে ব্যবহার করে থাকে; এর সঙ্গে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা কোথায় জানি না। সুতরাং, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের জন্য শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করা, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা ইত্যাদির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রবণতা, খেয়াল ও উদ্দেশ্য বন্ধ করা। সন্ত্রাসের উৎসে হাত না দিয়ে কারো রাজনীতি করার অধিকার নিষিদ্ধ করলে খুব একটা কাজের কাজ হবে বলে মনে করি না। এতে সমস্যাই বাড়বে, কমবে না।

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক ও ডিন, সমাজবিজ্ঞান, কলা ও ভাষা অনুষদ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলাম লেখক।

JUL 05 2002